রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ প্রকাশিত পুস্তক

পূর্ববঙ্গ

ও

হিন্দু সমাজ

বই-ত নয় যেন একটি স্ফুলিঙ্গ

(১৯৪৬)

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ প্রকাশিত পুস্তক

পূর্ব্ববঙ্গ ও হিন্দু সমাজ

বই-ত নয় যেন একটি স্ফুলিঙ্গ (১৯৪৬)

(১৯৪৬ সাল। ভারতে তখনও ইংরেজ শাসন চলছে। অবিভক্ত বাঙলায় তখন সুরাবর্দীর নেতৃত্বে মুসলীম লীগ-এর সরকার। স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে, সারা ভারত সে আন্দোলনে উত্তাল। দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে মুসলীম লীগ কোলকাতার বুকে শুরু করলো Direction Action। কলকাতায় হল নির্বিচারে হিন্দু হত্যা। Statesman লিখল 'The Great Calcutta Killing' নির্বাচারে হিন্দু হত্যা। বিভৎস সে হত্যাকাণ্ড।

এখানেই শেষ হল না। ১০ই অক্টোবর ১৯৪৬ অবিভক্ত বাঙলার নোয়াখালি জেলায় শুরু হল হিন্দু হত্যার দাঙ্গা। হাজারে হাজারে হিন্দুর ঘরবাড়ী পুড়লো, হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুন্ঠন চললো। হাজার হাজার হিন্দু নির্ম্মমভাবে নিহত হল। কিছু হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করা হল, কিছু মায়েদের, মেয়েদের মুসলমানের ভোগদখলে নেওয়া হল। দিনের পর দিন ঘটে চলা সে ঘটনা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি নিদারুন মর্মান্তিক। এরই মধ্যে আক্রান্ত তথাকথিত ধর্মান্তরিত কিছু নারী-পুরুষ কোনরকমে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা স্বধর্মে ফিরতে চান।

করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে জেহাদী আক্রমন

দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে পাকিস্থান তৈরীর সাথে সাথে জেহাদী ইসলামীরা করাচীর বিরাট রামকৃষ্ণ মিশনকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে ৬০ হাজার বই-এর গ্রন্থাগার। করাচীর ঐ মঠের প্রধান ছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। যিনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি হয়েছিলেন। করাচীর ঐ মিশনের পাঠাগারে স্বামী রঙ্গনাথানন্দর বক্তৃতা শুনতে আসত জিন্না, লালকৃষ্ণ আদবানী।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ করাচী থেকে এক বস্ত্রে তাও সাদাবস্ত্রে করাচী থেকে বিমানে

চলে আসেন ঢাকা বিমানবন্দরে। সেখান থেকে আসেন ঢাকার রামকৃষ্ণ আশ্রমে জীবন হাতে নিয়ে।

এই সময় ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া আসা ছিল এখন একটি স্কুলছাত্রের নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মহারাজের প্রিয় পাত্র রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন। এই সময় রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশ করেছেন 'পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু সমাজ'। পুনর্মুদ্রণের জন্য এই পুস্তিকা আমরা নোয়াখালি ও ঢাকা থেকে সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে প্রাণে বেঁচে আসা এবং বর্তমান সল্টলেক লাবনী নিবাসি শ্রী রবীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে পেয়েছি। 'পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু সমাজের' সাথে রবীন বাবুর সেই সময়ের স্মৃতিকথা আজ এক ইতিহাস।

শুধু কোলকাতা নোয়াখালি নয়। জেহাদী আক্রমন ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনেও হয়েছে। সেই ইতিহাসও এই স্মৃতি কথায় পাব। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে রাখতে হবে—'যে কেহ হিন্দু ধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়। একটি শত্রু অধিক হয়।")

বইত নয় যেন একটা স্ফুলিঙ্গ

১৯০ বৎসর ভারতে রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে অবস্থার চাপে ইংরেজরা যখন এদেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্য ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা কাফের (ঘৃণিত) হিন্দুদের সঙ্গে এক সাথে থাকলে ইসলাম বিপন্ন হবে ধুয়া তুলে তাদের জন্য একটা আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মহড়া হিসাবে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন হিসাবে ঘোষণা করে কলকাতা এবং মুসলিম লীগের আতুঁড়ঘর ঢাকা শহরে যে প্রলয় কান্ড ঘটিয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ আমি আমার লিখিত বইগুলোতে উল্লেখ করেছি, ঢাকা শহরে ১৬ই আগষ্ট এর নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ গুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ট্রাক বোঝাই করে আমাদের পাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তাতে ছিল উলঙ্গ মহিলা এবং মস্তকহীন শিশুদের মৃতদেহও। বাধ্য হয়ে আমরা ট্রাক থেকে হাত পা ধরে মৃতদেহগুলি নাবিয়ে গণসৎকার করাতাম।

ট্রাকের পাটাতনে ত্রিপল পেতে দেওয়া হতো যাতে রাস্তায় রক্ত না পড়ে। আমাদের পা রক্তে ডুবে যেত। কলকাতা শহরে ঐ হত্যালীলায় প্রথম তিন দিনে ২০,০০০ লোক নিহত হলো, এত লাস গঙ্গায ভাসিয়ে দেওয়া হয়ে ছিল যে নৌকা

চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মাংসে শকুন কুকুরেরও অরুচি ধরে ছিল। এরপর যখন হিন্দু এবং শিখরা রুখে দাঁড়াল তখন মুসলিম লীগ সরকার প্রমাদ গুনলো। এরপর মুসলিম লীগ বেছে বেছে বাংলার সবচেয়ে হিন্দু সংখ্যালঘু জেলা নোয়াখালী তাদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গিনিপিগ হিসাবে ১০ অক্টোবর ১৯৪৬ সেখানে হিন্দু নিধন আরম্ভ হলো হত্যা লুটপাঠ অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, বলপুর্বক বিবাহ, অপহরণ মহিলাদের মাটিতে চিৎকরে শুইয়ে, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া, গরু জবাই করা রক্ত দিয়ে মূর্তিগুলি স্নান করানো এবং তারপর সেগুলিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আদায়ের জন্য হিন্দুদের মনে ভীতি সঞ্চার করার প্রয়াস করা হলো। এই বর্বরোচিত ঘটনা প্রথম দশদিন লীগ সরকার গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল কারণ সমস্ত টেলিগ্রাফের তার কেটে, রাস্তা কেটে নোয়াখালীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। এরপর অবস্থা একটু শান্ত হলে নোয়াখালীতে স্বেচ্ছাসেবকরা যেতে আরম্ভ করলো। গান্ধীজি এই হত্যালীলা আরম্ভ হওয়ার ২৭ দিন পর গিয়ে গ্রাম পরিক্রমা আরম্ভ করলো, ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে কিছু স্বেচ্ছাসেবক নোয়াখালী রওনা হলো। আমিও যাবো বলে মনস্থির করলাম ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের একজন অত্যন্ত প্রিয় পাত্র এবং মঠের একজন কর্মী হিসাবে যাত্রার আগের দিন বৈকালে গিয়ে মহারাজের সাথে দেখা করলাম। তিনি বল্লেন "তুই যখন যাচ্ছিস দেখত ঐ প্যেকেটে কিছু বইপত্র এসেছে মনে হয় নোয়াখালী সম্বন্ধে কিছু খবর আছে।" তখন মঠের রান্নাঘর থেকে সব্জি কাটার বঁঠি এনে প্যেকেটের দড়ি কেটে এক কোনা থেকে ৭/৮ টা বই নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। রাত্রে বইগুলি চোখ বোলানোর সময় হয়নি। পরের দিন ঢাকা থেকে রওনা হয়ে তার পরদিন সকালে চৌমুহানী ষ্টেশন থেকে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে আমার গ্রামের বাড়ী কালিকাপুর পৌঁছালাম, ইতিমধ্যে অনেক স্বনামধন্য নেতা নেতৃ চৌমুহানীতে ওখানকার ধনী ব্যবসায়ীদের আতিথ্য গ্রহণ করে তার পর গ্রামগুলির দিকে রওনা হলেন। আর যারা অত্যন্ত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক প্রাণের টানে সেখানে গিয়েছেন তারা সব আমাদের বাড়ীতে উঠেছে। আমিও তাদের সাথে উদ্ধার কাজে রওনা হলাম, তাদের অনেকের নাম আমার এখন আর মনে নেই তবে শ্রী অমর সরকার, রমেন চক্রবর্তী, যোগেশ চৌধুরীর নাম আমার বিশেষ করে মনে আছে। তারা কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি করতো। গ্রামগুলিতে গিয়ে দেখি হিন্দুরা সব মুসলমান হয়ে বসে আছে পরনে লুঙ্গী, মাথায় সাদা টুপির উপর ভারতের মানচিত্র তার মধ্যে যে অংশগুলি তারা পাকিস্তান বলে দাবি করছে তা সবুজ রংএ ছাপা, লেখা

পাকিস্তান জিন্দাবাদ্। মহিলাদের হাতে শাখা নেই কপালে সিঁদুর নেই, চোখগুলি জবাফুলের মত লাল। মন্দিরগুলোর কোন চিহ্ন নেই। আমরা তাদেরকে বল্লাম আপনারা চলুন উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যাবো। তারা প্রশ্ন করলো বাবু আমরা কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছি নামাজ পড়েছি। আমাদের মুখে গোমাংস দিয়েছে বাড়ীর মেয়েদেরকে অপহরণ করা হয়েছে। হিন্দুরা কি আমাদের আবার সমাজে নেবে? আমাদের হাতে কি জল খাবে? আমরা বল্লাম আমাদের ধর্মগুরুরা এই নির্দ্দেশ দিয়েছে আপনারা বিনা দ্বিধায় স্বধর্মে ফিরতে পারবেন। তারা আমাদের মুখের কথা বিশ্বাস করলো না। তখন ছাপার অক্ষরের বই পড়তে তারা বিশ্বাস করলো এবং দলে দলে বাড়ী ছেড়ে আমাদের সাথে বেরিয়ে এলো। এতে মুসলমানরা আপত্তি করলো না। কারণ হিন্দুরা চলে গেলে স্থাবর অস্থাবর জমি জমা পুকুর তাদের দখলে আসবে। ইতিমধ্যে এই বই এর সংবাদ দাবানলের মত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, প্রথম দিনের বইটা তারা টানাটানি করে ছিঁড়ে যে যা পেরেছে এক এক পৃষ্ঠা এক একজন নিয়ে গেছে। এই বই-এর পৃষ্ঠা দেখিয়ে ধর্মান্তরিত হিন্দুদেরকে বের করে আনতে আরম্ভ করলো। এই বই-এর সংবাদ কোনক্রমে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনীর স্ত্রী সুচেতা কৃপালনীর নিকট গেল। রাত্রে বাড়ি ফিরে এলাম, পরদিন সকালে ৩/৪ কপি সঙ্গে নিয়ে গেলাম এবং সুচেতা কৃপালনীর সাথে আমার দেখা হলো। বইটায় চোখ বুলিয়ে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বল্লেন তুই করছিসটা কি রবি? এরপর তার সাথে আমার অনেক বার দেখা হয় আমি তাকে পিসিমা বলে ডাকতাম। আমার এক পিসিমা উষারাণী গুহরায় সুচেতা কৃপালনীর নারী উদ্ধারের স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করতেন। ঐসব কাজে আমার পূর্ব পরিচিত অনেক নেতা নেত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তার মধ্যে শ্রীমতী লীলা রায় এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে নোয়াখালীর দাঙ্গার নায়ক গোলাম সারোয়ার ফতোয়া দিয়ে দিলেন সুচেতা কৃপালনীকে যে ধর্ষণ করতে পারবে তাকে গাজী উপধিতে ভূষিত করা হবে এবং বহুত টাকা ইনাম দেওয়া হবে। তাই তিনি নিজের সম্মান রক্ষাকল্পে সবসময় পটাসিয়াম সাইনাইডের ক্যাপসুল গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকা একবার চিন্তা করুন। যেখানে কংগ্রেস সভাপতির স্ত্রীর এই অবস্থা সেখানে সাধারণ হিন্দুনারীদের কি অবস্থা হয়েছিল। পরবর্তী কালে ১৯৫০ সালে ঢাকার তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু নিধনের শিকার হয়ে এক বস্ত্রে যখন কলকাতা এলাম তারপর পিসিমা (উষারানী গুহরায়) আমাকে বল্লেন চল লাখনৌ থেকে বেড়িয়ে আসি সুচেতাদির বাড়ীতে উঠবো। তোকে দেখলে খুবই খুসী হবে।

আমি বল্লাম তিনি এখন একটা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কি আমাদের কে পাত্তা দেবেন? পিসিমা বল্লেন তুই চলনা। আমিতো বিনা নোটিশে বারকয়েক তার বাড়ী গিয়ে থেকে এসেছি। তবে খুবই ব্যস্ত রাত্রে ছাড়া কথা বলার সময় নেই। তোর সম্বন্ধে দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করেছে। আমার মনে হয় বইটার অপরিসীম গুরুত্ব অনুভব করে আমার হাত থেকে পেয়ে তিনি আমাকে মনে রেখেছেন।

১৯৫০ সালে ঢাকা থেকে এসে একদিন বেলুড় মঠে গেলাম স্বামী মাধবানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। ৩/৪ জন সাধুকে জিজ্ঞাস করার পর একজন বল্লেন ঐ যে স্বামীজির মন্দিরের নিকট পায়চারী করছেন তিনি। আমি সামনে গিয়ে হাঁটুগেড়ে আমার দুই হাত তাঁর দুই পায়ে স্থাপন করে আমার মস্তক তাঁর শ্রীচরণ যুগলের উপর রেখে চোখের জলে পা দুটো সিক্ত করে দিয়ে ২/৩ মিনিট পর উঠে দাঁড়ানোর পর তিনি দুহাত আমার মাথার উপর হাত স্থাপন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ২/৩ মিনিট আমি বাকরুদ্ধ হয়ে রইলাম, তারপর বল্লাম মহারাজ আমি ঢাকা থেকে এসেছি। স্বামী জ্ঞানত্মানন্দ, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ প্রভৃতি মহারাজদের স্নেহধন্য এবং ঢাকা মিশনের একজন সেচ্ছাসেবক, যে ব্যাপারে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি সেটা হলো নোয়াখালীতে হিন্দু নিধনের পর **"পূর্ব্ববঙ্গ ও হিন্দু সমাজ"** নামে বইটা যদি আপনারা না ছাপতেন তবে অধিকাংশ হিন্দুরাই স্বধর্মে ফিরে আসতো না। তারা মুসলমান হয়েই ওখানে থেকে যেত, (এখানে উল্লেখ্য যে ঐ সময় নোয়াখালীতে হিন্দুসমাজ খুবই গোঁড়া ছিল। সময়টা ১৯৪২/৪৩ হবে আমাদের গ্রামের কয়েকজন নব্য কম্যুনিষ্ট এরা বামফ্রন্টের মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের সমসাময়িক। গোপনে মুরগীর মাংস রান্না করে খাওয়ার অপরাধে সমাজচ্যুত হয়েছিল অর্থাৎ তাদের হাতে কেউ খাবেনা কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হলে ওরা বাদ ইত্যাদি।

স্বামীজির থেকে জানা গেল এই কাজটা শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত। কি অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁদের করতে হয়েছে, অতজন ধর্মগুরু এবং সমাজপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের লিখিত বিবৃতি এনে তা ছাপিয়ে সময়মত বিতরণ করা এখন আমরা তা কল্পনাও করতে পারিনা। এখনকার মত তখন ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ইত্যাদি ছিল না। আমি আজও অবাক হয়ে পড়ি এই দুই মানব দেশপ্রেমিকের দূরদৃষ্টি দেখে। আর যেসব অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সাম্প্রদায়িক বলে গালি না দিয়ে জলগ্রহণ করেননা, তাদের মুখে থুতু ফেলতেও আমার ঘৃণা বোধ হয়।

ভগবানের অশেষ কৃপায় আমি এক কপি সংগ্রহ করে রেখেছি এবং আজ ৬৬

বৎসর পর তা আবার পুনঃ প্রকাশিত হচ্ছে ভাবী কোনো গবেষকদের কাজে লাগবে বলে।

যেহেতু বইটা রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত তাই এখানে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করছি কারণ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত কোন বইতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাইনি।

করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে জেহাদী আক্রমণ

দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে আমার অভ্যাসমত স্কুল থেকে এসে বিকালে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়ার পর মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মহারাজ আমাকে বল্লেন, রবি "তুই এক্ষুণি গিয়ে শ্রীশকে ডেকে নিয়ে আয়, করাচী থেকে মহারাজ এসেছেন তাঁর দুটো পাঞ্জাবী সেলাই করতে হবে। আমি সাইকেলে গিয়ে শ্রীশবাবুকে সামনে বসিয়ে মঠে ফিরলাম, শ্রীশবাবু মিশনের ভক্ত এবং মহারাজদের পাঞ্জাবী সেলাই করতেন। তিনি মাপ নিয়ে চলে গেলেন রাতভর পরিশ্রম করে দুটো পাঞ্জাবী তৈরী করে সকালে মঠে পৌঁছে দিলেন। পাঞ্জাবীগুলো সাদা কাপড়ের ছিল, পরদিন আমি মঠে গেলে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের আদেশ অনুসারে আমাদের পাড়ার 'রঞ্জক সাবান" কোম্পানীর বাড়ী থেকে দুটো গেরুয়া রং করার সাবান এনে তাঁদের নির্দেশ অনুসারে পাঞ্জাবী দুটোকে গেরুয়া রং করে দিলাম। কার জন্য এই দুটো পাঞ্জাবী রং করা হলো জানেন? তিনি **করাচী রামকৃষ্ণ** মিশনের সভাপতি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ পরবর্তীকালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার এক দিন আগে থেকেই অর্থাৎ ১৩ই আগষ্ট ১৯৪৭ থেকেই করাচীতে হিন্দু এবং শিখদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার আরম্ভ হয়। মুসলমানরা করাচী রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঐ সময় করাচী দিল্লী বিমান চলাচল বন্ধ, ঢাকা করাচী বিমান চলতো তাই রঙ্গনাথানন্দজী এক কাপড়ে বিমান যোগে ঢাকা এসে রামকৃষ্ণ মিশনে উঠেছেন। এরপর প্রায় তিনমাস তিনি ঢাকা মঠে ছিলেন। প্রায়ই কোননা কোন ভক্তের বাড়ীতে বৈকালে তার ধর্মালোচনা সভা হতো, আমার কাজ ছিল ওনাকে রিক্সা করে নিয়ে যাওয়া এবং সভা শেষে মঠে পৌঁছে দেওয়া। যেদিন যার বাড়ীতে সভা হতো তাঁরাই যাতায়াতের রিক্সা ভাড়া দিয়ে দিতেন। শ্রী জুনারকর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বাড়ীতেই অধিকাংশ দিন সভা হতো। আমার সৌভাগ্য যে এহেন মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রায়

তিন মাস একই রিক্সায় যাতায়াত করার সুযোগ পেয়েছি। এখানো রঙ্গনাথানন্দজীর লেখা পত্র আমার সংগ্রহশালায় আছে, করাচী মঠে থাকাকালে লালকৃষ্ণ আদবানী এমন কি পাক প্রেসিডেন্ট মঃ আলী জিন্নাও মিশনে এসে তাঁর বক্তৃতা শুনতেন। কথিত আছে স্বামী বিবেকানন্দের পর রামকৃষ্ণ মিশনে অতবড় বক্তা আর কেউ ছিলেন না। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচারে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছেন। ঢাকা থাকাকালিন আমি জানতে পারি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে হিন্দু নিধনের সময় করাচী মঠের গ্রন্থাগারের প্রায় ৬০ হাজার দুঃষ্প্রাপ্য বই পুড়িয়ে দেয় জেহাদী মুসলমান দুস্কৃতিরা। তার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সংগ্রহে থাকা সিন্ধু সভ্যতার অনেক নিদর্শন ছিল যা তারা রক্ষা কল্পে মিশনে জমা দিয়েছিলেন। এরপর করাচী মঠ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তার সুদ থেকে ভরতুকি দিয়ে মিশন বইপত্র গুলি সস্তাদরে বিক্রি করে, এই লাইব্রেরীটা পোড়ানোর ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের একটি লেখা প্রণিধান যোগ্য—

"তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র" আল্লা এক এবং মহম্মদই এক মাত্র পয়গম্বর" যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে। যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে। যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে, যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে ইহাই মুসলমান ধর্ম।"

—স্বামী বিবেকানন্দ Practical Vedanta

এবার আসা যাক কেন রঙ্গনাথানন্দজী বিতাড়িত হলেন এবং করাচী মঠ পোড়ানো হলো। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কেরালা প্রদেশের নামবুদ্রী ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। করাচী শহর এবং পাকিস্তানে সব শহর গুলিতে ছিল খাটা পায়খানা যার মলগুলি পরিষ্কার করে হিন্দু মেথররা বাইরে ফেলে দিত। এরা ছিল মাদ্রাজী তথা দক্ষিণ ভারতীয়। ঐ সময় হিন্দুহত্যা আরম্ভ হলে ঐ মেথররা টাকা তুলে দুটো জাহাজ ভাড়া করে করাচী থেকে মাদ্রাজ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পাক সরকার দেখলো স্বপরিবারে সব মেথর চলে গেলে মল ফেলবে কে? তখন বলপূর্বক জাহাজ দুটো পাক সরকার আটক করে রাখে এবং তাদের মাদ্রাজ যাত্রা বন্ধ করে দেয় এবং রটিয়ে দেওয়া হয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর পরামর্শে এই মেথররা

পাকিস্তান ত্যাগ করছে ফল- স্বরূপ মঠ ধ্বংস এবং অগ্নিসংযোগ, ঐ সময় করাচী থেকে প্রচুর সিন্ধিরা বিমান যোগে ঢাকা এসে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে মিশনে উঠতো, তাছাড়া রাত্রে মঠে মহিলাদের থাকা নিষিদ্ধ বলে, অনেক সিন্ধি পরিবারকে আমি ঢাকার মিশনের ভক্তদের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিই। ২/৩ দিন থাকার পর তারা ট্রেনযোগে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে ভারতে ঢুকেছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ বিগত যৌবনা নারী এবং প্রৌঢ়। অর্থাৎ যুবতীরা অপহৃতা হয়েছেন এবং যুবকরা নিহত হয়েছেন।

এই সব ইতিহাস হিন্দুরা কোথাও লিপিবদ্ধ করেনি বরং ইতিহাস বিকৃত করেছে অথবা মিথ্যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে ইতিহাস ধ্বংস করেছে। অন্নদাশঙ্কর রায় তার বই "যুক্ত বঙ্গের স্মৃতি" পৃ. ১১২ তে লিখেছেন—"একদিন কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকীল ও নেতা কামিনী কুমার দত্ত ময়মনসিং এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে বলেন, যা পড়েছো বা শুনছো সব অতিরঞ্জিত। নোয়াখালীতে খুন হয়েছে শ আড়াই (২৫০), ধর্ষণের কেস খুবই কম, জোর করে যাদের মুসলমান করা হয়েছিল তারা এক দিন কি দুদিন বাদে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হয়েছে মোল্লাদের কাছে এটা একটা নুতন অভিজ্ঞতা।"

নোয়াখালীতে হিন্দু নিধনের অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি এডওয়ার্ড স্কিপার সিমসন (ICS) লিখেছেন। এক অঞ্চলে ৩০০রও বেশি এবং অন্য এক অঞ্চলে ৪০০রও বেশি নিরীহ মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

এই মিথ্যাবাদী উকিল বাবু বলেছে, "একদিন বা দুইদিন বাদে হিন্দুরা আবার প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হয়েছে। আমার প্রশ্ন এই গন্ডগোলের সময় কি প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব? একজন ব্রাহ্মণ নেয়াখালী থেকে তার ভাইকে একপত্র লেখেন 'আমরা সব কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছি'। অভ্যাস বসত চিঠির প্রথমে তিনি শ্রীশ্রী হরি সহায় লেখেন। পোস্ট অফিসে সেই চিঠি গেলে মুসলমানরা শ্রীশ্রী হরি মুছে দেয় এবং লেখার জন্য প্রচন্ড মারধর করেন।

১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট একশনের উপর সরকার যে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন তার রিপোর্টের সমস্ত কপি ডঃ বিধান রায় পুড়িয়ে দেন। ১৯৫০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু নিধনের শিকার হয়ে কলিকাতা আসার পর রোজ বৈকালে আমার মামা কেশব ঘোষের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে যেতাম মামা ঐ পত্রিকার চিফ্ সাব এডিটার ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা আমাকে ছেঁকে

ধরতেন। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুনিধনের সংবাদ জানতে আমি অনেক বর্বরতার সংবাদ দিয়েছি তারা নোট করে নিয়েছে কিন্তু কোন সংবাদই ছাপা হয়নি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম বিধান রায় আন অফিসিয়েল আদেশ জারি করেছে। পূঃ পাকিস্তানের কোন সংবাদ যাতে ছাপানো না হয়! এইত আমাদের চরিত্র। সত্য সেলুকাশ কি বিচিত্র এই দেশ। সত্য ইতিহাসও এদেশে লেখা চলবে না।

ঃ উপসংহার ঃ

দেশভাগের একবুক জ্বালা নিয়ে এতদিন চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ ১৯৯৯ সালের শীতের এক সন্ধ্যাবেলা দুই ভদ্রলোক এসে কলিং বেল বাজালো। দরজা খুলে দেখি শ্রীঅজিত কুমার বিশ্বাস এবং ডঃ নরেন্দ্রলাল দত্ত বণিক। তাদেরকে আমি অনেক সভাসমিতিতে দেখেছি কিন্তু কোন কথাবার্তা হয়নি। এরপর ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ আমার অভিজ্ঞতার কিছু কথা বলার পর তাঁরা বল্লেন আপনি এইসব লিখছেন না কেন? আমি বল্লাম লিখলে কে ছাপাবে? মনে হলো তারা আমায় পেট্রলটেঙ্ক-এ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে একটু একটু করে লিখে স্বস্তিকায় পাঠালাম এবং তারা ছাপতে আরম্ভ করলো। ভগবানের অশেষ কৃপায় এ পর্যন্ত আমার সাড়া জাগানো কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়ে অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে তবুও মনে হয় আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক, নিতান্তই একা। দেশে তথাকথিত সেক্যুলারইজমের হাওয়া বইছে।

* * * * * * * *

এই ভারত পুনর্বার জাগ্রত হইবে এবং যে মহাতরঙ্গ এই কেন্দ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, মহাপ্লাবনের ন্যায় তাহা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বাসিত করিয়া মুক্তিমুখে লইয়া যাইবে। ইহা আমাদের বিশ্বাস এবং শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাণপনে ইহারই সাধনে আমরা কটিবদ্ধ।

প্রথম পক্ষে এই অতি প্রাচীন সভ্যতা সমাধানে সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইয়া যাইবে। এই ভারতবর্ষ পুনরায় বালকত্বপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া উন্নতির পথে বহুকালান্তরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবে। দ্বিতীয় কল্পে ভারতীয় সভ্যতার ও আর্য্যজাতির বিনাশ অতি শীঘ্রই সাধিত হইবে। কারণ, (যে কেহ হিন্দু ধর্ম হইতে বাহিরে যায়, আমরা যে কেবল তাহাকে হারাই তাহা নয়, একটী শত্রু অধিক হয়) ঐ প্রকার স্বগৃহ-উচ্ছেদকারী শত্রুদ্বারা মুসলমান অধিকারকালে যে মহা অকল্যান সাধিত হইয়াছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তৃতীয় কল্পে মহাভয়ের কারন এই যে, যে

ব্যক্তির বা জাতির যে বিষয়ে প্রাণের ভিত্তি পরিস্থাপিত তাহা বিনষ্ট হইলে সে জাতিও নষ্ট হইয়া যায়। আর্য্যজাতির জীবন ধর্মভিত্তিতে উপস্থাপিত। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে আর্য্যজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

মুসলমান বা খ্রীষ্টানদিগকেও হিন্দু ধর্ম্মে আনিবার বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে। কিন্তু উপনয়নাদি সংস্কার কিছুদিনের জন্য তাহাদের মধ্যে হওয়ার আবশ্যক নাই।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনে তথাকথিত 'সেকুলার'দের হৃদয় কি ব্যথিত হবে না?

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বাংলাদেশে নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা নেমে এসেছে। সংবাদে প্রকাশ, বাংলাদেশের ৯টি জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ চূড়ান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওই সমস্ত জেলাতেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা ঘরবাড়ি ছেড়ে স্থানীয় মন্দির, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরকারি অফিসে আশ্রয় নিয়েছেন। আদৌ তাঁরা তাঁদের গৃহে আর ফিরতে পারবেন কি না—তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। সংবাদেই প্রকাশ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, লালমণিরহাট, গাইবান্ধা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম এবং যশোরের বিস্তীর্ণ এলাকায় হিন্দু, সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ চলছে। ঢাকা থেকে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে—**"বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনা অব্যাহত। বুধবার সকালে নেত্রকোণা জেলায় একটি কালীমন্দিরে তাণ্ডব চালায় বেশ কিছু দুষ্কৃতী। এরপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় তাতে।"** পিটিআই আরও জানাচ্ছে, নির্বাচনের পর ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই মন্দিরে হামলার ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ওই সূত্রে এও জানা গিয়েছে, নির্য্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে চলে আসার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর এই নির্যাতনের ঘটনায় যদি অনুপ্রবেশের ঢল নামে, তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উপর চাপ বাড়বে। আবার ভারতের ভিতর পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমকে এই অনুপ্রবেশের ধাক্কা বেশি সামলাতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই, বাংলাদেশের এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় ভারত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবিষয়ে একটি নোট তৈরি করেছে বলে জানা গিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের কাছে সেই নোটটি পাঠানোও হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তা আরও কঠোর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাংলদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর এই হামলার ঘটনা নতুন নয়। বলা যায়, বাংলাদেশ জন্মের আগেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেই সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা শুরু হয়। এই বিরতিহীন নির্যাতনের ফলেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী অতীতের ৩০ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে। আর ক'বছুর পর এই হারও যে অনেক কমেই আসবে—তা বলাই যায়। সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা শুরু করেছে কট্টর মৌলবাদী জামাত-ই-ইসলাম এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি। বিএনপি জন্মাবধি মৌলবাদ ঘেঁষা একটি দল এবং জামাতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও নিবিড়। মৌলবাদী জামাতের সমর্থন নিয়ে খালেদা এক সময় বাংলাদেশে সরকারও চালিয়েছেন। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত—অর্থাৎ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্তমানের বাংলাদেশ–ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে উগ্র এবং কট্টর মৌলবাদীরা সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাদার আক্রমণ বজায় রেখেছে একটিই কারণে। কারণটি হল, এই মৌলবাদীরা একটি 'ক্লিনজিং অপারেশন' চালাতে চায় বাংলাদেশে। এরা চায় না—বাংলাদেশে একটি হিন্দু পরিবারেরও অস্তিত্ব থাকুক। আর এ কারণেই এই ধারাবাহিক আক্রমণ। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর এই নির্যাতন যে শুধুমাত্র সে দেশের পক্ষেই শঙ্কার বিষয়—তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে এর প্রভাব এই উপমহাদেশে, এমনকী সমগ্র বিশ্বে পড়তে বাধ্য। প্রথমত, এর ফলে ভারত সীমান্তে যদি অনুপ্রবেশের ঢল নামে—তাহলে ভারতের অর্থনীতিতে চাপ পড়বে-এ যেমন অনস্বীকার্য; তেমনই বাংলাদেশে এরকমই 'ক্লিনজিং অপারেশন' যদি নির্দ্বিধায় চালিয়ে যেতে থাকে মৌলবাদীরা—তাহলে এই উপমহাদেশে শান্তি এবং সম্প্রীতির পরিস্থিতিটাই নষ্ট হবে। এমনিতেই পাকিস্তানে উগ্র মৌলবাদীরা যথেষ্ট শক্তিশালী, ওই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রটিকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে; তদুপরি বাংলাদেশেও যদি মৌলবাদীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে—তাহলে ভারতের শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে বৈকি। পাকিস্তানি আই এস আই এবং বাংলাদেশি মৌলবাদীদের প্ররোচনায়, উসকানিতে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ভারতের অভ্যন্তরে মৌলবাদী শক্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করবে—এমন ঝুঁকি থেকেই যায়।

বাংলাদেশে এই সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার রয়েছে। প্রথমত, ধর্মের বিচারে না গিয়েও বলতেই হয়—যারা বাংলাদেশে নির্যাতিত হচ্ছে—তারা জাতিগতভাবে বাঙালি। বাঙালির নির্যাতনে বাঙালির উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয়ত, মৌলবাদীদের আক্রমণে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারগুলি যদি পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে চায়, তাদের প্রথম ঠিকানা হবে পশ্চিমবঙ্গই। সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের ধাক্কা সবথেকে বেশি সামলাতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠাই, স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পশ্চিবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ, এ রাজ্যের প্রশাসান বা প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলি—কেউই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু গোষ্ঠীর উপর মৌলবাদীদের হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন নয়। বলা ভালো, কোনও উদ্বেগ তারা প্রকাশ করেনি কোনওদিন। ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী নানাভাবে নিপীড়িত হলেও, এপারের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীসমাজ বা রাজনৈতিক শক্তিগুলি—কেউই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু গোষ্ঠীর উপর মৌলবাদীদের হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন নয়। বলা ভালো, কোনও উদ্বেগ তার প্রকাশ করেনি কোনওদিন। ১৯৪৭-এর পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী নানাভাবে নিপীড়িত হলেও, এপারের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীসমাজ বা রাজনৈতিক শক্তিগুলি এনিয়ে কখনও মুখ ফুটে রাটি কাড়েনি। বরং, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় উদাসীন থেকে অতীতে পূর্ব পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে এক চপল আবেগ এরা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে বরাবর এদের এই আবেগী চর্চায় সত্যটি বরাবরই চাপা পড়ে থেকেছে।

ওপরের হিন্দুরা নির্যাতিত হলে এপারের এই নীরবতার প্রকৃত রহস্যটি কী? রহস্যটি আর কিছুই নয়। তথাকথিত সেকুলার সেজে থাকার যে অসুখ সেই ব্রিটিশ-ভারতের সময় থেকে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজকে গ্রাস করেছিল—অদ্যাবধি তা থেকে তাদের মুক্তি ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তার একটি প্রবন্ধে অতীব সুন্দর একটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখেছিলেন—ব্রিটিশের আগেও ভারত মুসলমান শাসকদের অধীনে ছিল। কিন্তু তখনও হিন্দু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মভাবনা থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি মুসলমান শাসকরা। ব্রিটিশশাসক কিন্তু হিন্দুসমাজের শিক্ষিত অংশকে হিন্দুত্ব সম্পর্কে বিমুখ করে তুলতে পেরেছিল। এই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ এবং

তাদের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক শক্তিগুলি এই ভ্রান্ত সেকুলারিজমের বশবর্তী হয়েই বরাবর সংখ্যালঘু তোষণটিকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে বাজারে চালাতে চেয়েছে। এরা মনে করেছে, বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের পক্ষে সরব হলে বোধকরি এদেশের সংখ্যালঘু মুসলিমসমাজ ক্ষুণ্ণ হবে। এক্ষেত্রেও এক ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েছে তারা। কিছু মৌলবাদী সংগঠন, কয়েকজন উগ্র মৌলবাদী মুসলিম নেতাকেই এরা মুসলমানসমাজের প্রতিনিধি মনে করছে। এই মৌলবাদী সংগঠনগুলি বা মৌলবাদী নেতারা যে সমস্ত মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি নয়—এ বোধটাই এপারের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ বা রাজনৈতিক শক্তিগুলির হয়নি। এই বোধ হয়নি বলেই, কলকাতার মতো শহরে মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনকে জনসভা করার অনুমতি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না প্রশাসন।

পরন্তু হিন্দু হিসাবে নিজেদের পরিচয় না দিতে চাওয়ার অহেতুক লজ্জা এপারের হিন্দু বুদ্ধিজীবী সমাজকে অনেকদিন পূর্বেই গ্রাস করেছে। যে কারণে লেবাননে ইরাকে, ইরানে, আফগানিস্তানে মানুষ গৃহহীন হলে, দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হলে এরা শোকপ্রকাশে যত তৎপর হয়, প্রতিবাদে যত মুখর হয়; **বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটিকে তারা বর্জনীয় এবং নিন্দনীয় বলেই মনে করে**। এপারের শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলির এই ধরনের অসৎ মানসিকতার কারণেই বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুরা। এপার থেকে আজ পর্যন্ত কোনও সহানুভূতি পাননি।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু উৎখাতে যদি মৌলবাদীরা 'ক্লিনজিং অপারেশন' চালায়; দশকের পর দশক ধরে বাংলাদেশে যদি হিন্দু সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হতে থাকে—তাহলে বিশ্বদরবারে তার প্রতিবাদ হবে না কেন? কেনই বা হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে অন্তত হিন্দুসমাজ সরব হবে না? হিন্দুসমাজ যদি সরবই হয়—তাতে অন্যায়ের সত্যই কি কিছু আছে? এপ্রসঙ্গে একটি উদাহরণ অবশ্যই টানা যেতে পারে। গুজরাত দাঙ্গাপরবর্তী সময়ে সেই ঘটনার নিন্দায় এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এবং মুসমিল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সরব হয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু তাদের সেই ভূমিকা নিয়ে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলেনি। প্রশ্ন তোলা বাঞ্ছনীয় হত না। তেমনই আজ যদি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুনির্যাতনের প্রতিবাদে হিন্দুসমাজের ভিতর আলোড়ন উঠে, হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে ঘটনার নিন্দায় সরব হন—তাহলে তাও নিশ্চয়ই

অন্যায় হবে না। **গুজরাত দাঙ্গার নিন্দা করে যদি মুসলিম বিশিষ্ট জনেরা 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা না পান; আশা করা যায়—হিন্দু নির্যাতনের নিন্দা করে হিন্দু সমাজের বিশিষ্টরাও 'সাম্প্রদায়িক' তকমা পাবেন না। আসলে, হিন্দুসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভিতর থেকে একটি প্রতিবাদ আসা উচিত ছিল।** দুঃখের—তা আসেনি। কেন আসেনি তার কারণ পূর্বেই বলেছি। শিক্ষিত হিন্দুসমাজ হিন্দুপরিচয়ে অযথা লজ্জিত হতে শিখেছে। অথচ, হিন্দুত্ব বিষয়টি লজ্জার নয়। তা বুঝে ছিলেন সিস্টার নিবেদিতার মতো বিদেশীও। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১৮৯৯ সালে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় নিবেদিতা লিখেছিলেন—**"হিন্দুত্ব একটি উদার ধর্মভাবনা। যা বিশাল বৃক্ষের মতো সকলকে আশ্রয় দেয়। প্রাচ্যের এই উদার হিন্দু দর্শনের কাছে পাশ্চাত্যের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে।"**

মনে রাখতে হবে, ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরই দেশ। হিন্দুধর্মের ঔদার্যই ভারতের ধর্ম এবং সমাজ ভাবনার মূল ভিত্তি। একথাও স্বীকার করতে হবে—ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্ম দুটিই বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। ভারতের মাটিতে ওই দুটি ধর্মভাবনার জন্ম হয়নি। এই উদার হিন্দুদর্শন ভারতের মূল ভিত্তি বলেই এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অত্যাচারিত হয়ে দেশত্যাগ করতে হয় না। হিন্দুদর্শন তার ঔদার্যের কারণেই, কখনও অন্য ধর্মের প্রতি আগ্রাসী হয় না। এই দর্শনটিকে বুঝলে নিজের হিন্দুপরিচয়ে অযথা লজ্জিত হওয়ার কারণ ঘটে না।

বাংলাদেশের অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা একটি মানবিক কর্তব্য। শুধু হিন্দুসমাজ নয়, সমাজের প্রত্যেক স্তরের ভিতর থেকে দাবী উঠুক, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষা করতে প্রয়োজনে রাষ্টসংঘ হস্তক্ষেপ করুক। বাংলাদেশে এবং বিশ্বের অন্যত্রও উগ্র মৌলবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এক প্রবল জনমত গড়ে উঠুক। আগামীদিনে এই কট্টর, অন্ধ মৌলবাদই যে মানবসভ্যতার বড় বিপদ—এ বোধ জাগ্রত হোক সকলের হৃদয়ে।

আর, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুর যন্ত্রণায় ধর্মমতনির্বিশেষে সমগ্র মানবহৃদয় একবার অন্তত আলোড়িত হোক। ব্যথিত হোক।

সৌজন্য ঃ 'বর্তমান'। ১৪ জানুয়ারী, ২০১৪